SEMINAR REPORT

November 2013

REPORT ON
ENABLING LAND ACQUISITION FOR INFRASTRUCTURE : A PARTICIPATORY APPROACH

(বাংলা প্রতিবেদন)

COMPACT TOWNSHIP FOUNDATION

প্রারম্ভিকা

কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশন

'অবকাঠামো উন্নয়নের স্বার্থে ভূমি অধিগ্রহন প্রক্রিয়ার বাস্তবমুখী ক্ষমতায়ন (enabling) : একটি অংশগ্রহণমূলক গবেষণা', শীর্ষক একটি সেমিনারের উপর এই রিপোর্টটি প্রস্তুত করা হয়েছে। কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশন এর তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনায় এই সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়। গত অগাস্ট ২০১৩ সালে অনুষ্ঠিত কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশনের উদ্বোধনী সেমিনারের অংশগ্রহণকারী বক্তাদের সামগ্রিক আলোচনার ফলাফল হিসেবে এই সেমিনারটির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ভূমি বিষয়ক সমস্যাগুলোর উপর একটি সুনির্দিষ্ট ও বিস্তারিত আলোচনা হওয়া উচিত বলে উক্ত সেমিনারে অংশগ্রহণকারী বক্তাগন অভিমত ব্যক্ত করেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, 'কমপ্যাক্ট টাউনশিপ' ধারণাটির সাথে ভূমি সংক্রান্ত বিষয়গুলি ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত।

অধুনা গবেষনায় দেখা গেছে যে, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার বাসস্থান সংকুলানের জন্য বাংলাদেশে প্রতি বছর শতকরা এক শতাংশ আবাদীভূমি হ্রাস পাচ্ছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ, বর্তমানে গ্রামীণ এলাকাগুলোতে বিক্ষিপ্তভাবে বসতি নির্মাণ, ও কৃষিভূমির অপ্রতুলতা - এই সমস্যাগুলোর সমাধান নিয়ে ড. সেলিম রশিদ এবং তাঁর সহকর্মীগণ দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে গবেষনা করছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিষয়ের অধ্যাপক ড. সেলিম রশিদ এই সমস্যাগুলির সমাধানের একটি সাধারণ নাম দিয়েছেন যা 'কমপ্যাক্ট টাউনশিপ' হিসেবে অভিহিত। ২০ হাজার বা তদূর্ধ্ব জনসংখ্যার জন্য বাসস্থান, স্কুল, বাজার, গ্রামীণ শিল্প ও স্থানীয় সরকারকে সমন্বয় করে 'কমপ্যাক্ট টাউনশিপ' নামক অবকাঠামোটি তৈরি করা হবে। বাসস্থানের চাহিদা মেটানোর জন্য নতুন জমিতে প্রচলিত আনুভূমিকভাবে বসতি নির্মাণ না করে উল্লম্ব প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হলে অর্থনৈতিক ভাবে লাভবান হওয়া সম্ভব। এর ফলে বাংলাদেশে আগামী ত্রিশ বছরের মধ্যে শতকরা ১০ ভাগ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করা যাবে।

কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশনঃ কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশন বা সিটি ফাউন্ডেশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদিত ও রেজিস্ট্রিকৃত একটি সংস্থা যা 'থিঙ্ক ট্যাঙ্ক' হিসেবে জুলাই ২০১২ সাল থেকে কাজ করছে। এটি একটি অরাজনৈতিক, অলাভজনক, বেসরকারি উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান। এর প্রধান উদ্দেশ্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক প্লাটফর্ম হিসেবে বাংলাদেশের ভূমি ব্যবহারজনিত সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করা ও এর সমাধানকল্পে রূপরেখা ও অবকাঠামো নিয়ে যাত্রা করা।

'অবকাঠামো উন্নয়নের স্বার্থে ভূমি অধিগ্রহন প্রক্রিয়ার বাস্তবমুখী ক্ষমতায়ন (enabling) : একটি অংশগ্রহণমূলক গবেষণা' গত জুন ২০১৩ সালে অনুষ্ঠিত হয়। প্রফেসর সেলিম রশিদ, এতে 'শেয়ারিং অফ বেনিফিট' শীর্ষক নোট উপস্থাপন করেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা জনাব আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী, 'ভূমি রেকর্ড ডিজিটালকরণ'শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এবং জনাব করিম গাজি ভূমি অধিগ্রহন বিষয়ক তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেন।তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. আকবর আলী খান সেমিনারের সভাপতিত্ব করেন।

প্রারম্ভিকা

কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশন

স্বনামধন্য পলিসি মেকার, অর্থনীতিবিদ, পরিকল্পনাবিদ, অধ্যাপক এবং উন্নয়ন গবেষকরা আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে সভায় অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া আরো অনেকে ভূমি বিষয়ক আলোচনায় অংশগহন করে সেমিনারটি প্রানদীপ্ত এবং সফল করেন। আমরা সবাইকে কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই। এবং বিশেষভাবে, স্থপতি ইমামুর হোসেন রুম্মানকে এই রিপোর্ট প্রস্তুত করার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ড. আবুল হোসেন
সেক্রেটারি জেনারেল
কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশন (সিটিএফ)
নভেম্বর, ২০১৩।

আলোচনা পর্ব_১

সম্মানিত প্রবন্ধ উপস্থাপক এবং প্যানেলিস্টদের আলোচনা পর্ব

ড. আবুল হোসেন
জেনারেল সেক্রেটারি
কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশন

ড. আবুল হোসেন, কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানানোর মাধ্যমে তার বক্তব্য শুরু করেন। তার মতে, কমপ্যাক্ট টাউনশিপ একটা উপায় যাতে বাংলাদেশে ১০% প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভবপর হতে পারে। কমপ্যাক্ট টাউনশিপের ধারনাকে শুধুমাত্র সেমিনার বা বইয়ের আকারে না রেখে, প্রফেসার সেলিম রশীদ সহ একটা ফাউন্ডেশন গড়ে তোলা হয়, যাতে এই আলোচনাটা ছড়িয়ে দেয়া যায়। তিনি বলেন, এই ফাউন্ডেশন একটা রেজিস্টার্ড ফার্ম হিসেবে কাজ করা শুরু করেছে। সেমিনারে উপস্থিত পরিকল্পনাবিদ এবং অর্থনীতিবিদ সহ সবাইকে এতে অবদান রাখার জন্য তিনি আহবান জানান। শুধু গবেষনাপত্র বা বইয়ে সীমাবদ্ধ না রেখে বাস্তব প্রনয়নের স্বপ্ন নিয়ে কম্প্যাক্ট টাউনশিপ এগিয়ে যাবে বলে তিনি মনে করেন। ভূমি বিষয়ক সমস্যা কম্প্যাক্ট টাউনশিপের সাথে প্রাসঙ্গিক একটি ইস্যু এবং কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশনের তত্ত্বাবধানে ভূমি বিষয়ক সমস্যাগুলোর উপর সুনির্দিষ্ট ও বিস্তারিত আলোচনা করার আহবান জানিয়ে তিনি বক্তব্য শেষ করেন।

জনাব মোঃ আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী
চেয়ারম্যান
ব্র্যাক নেট

সাবেক উপদেষ্টা
তত্ত্বাবধায়ক সরকার, বাংলাদেশ

আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী সকলকে শুভ সকাল জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। তাঁর মতে, বাংলাদেশে ভূমি প্রশাসনের সকল সমস্যার মূলে আছে ভূমি প্রশাসন ও রেকর্ড প্রস্তুতকরণ ও তার সংরক্ষন পদ্ধতি। বাংলাদেশে প্রাথমিক ভাবে সর্বপ্রথম মুঘল আমলে তৎকালীন পদ্ধতিতে ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছিল। সিএস (cadastral survey) রেকর্ডের সময় প্রথম আনুষ্ঠানিক ভিত্তিতে Cadastral Map বলে পরিচিত মৌজা ম্যাপ তৈরী হয়। প্রিন্টেড রেকর্ড ১৯ ও ২০ শতকে হওয়া শুরু করে। জেলা কমিশনার এবং জেলা জজের অফিসে সংরক্ষিত ব্রিটিশ আমলের পুরাতন রেকর্ডগুলোর আধুনিকায়ন না হওয়ার ফলে নষ্ট এবং ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে যাচ্ছে। তাঁর মতে এটি তার মতে ভূমি রেকর্ডের অন্যতম সমস্যা। তিনি বলেন, ফতুল্লা ও মানিকগঞ্জে রেকর্ড এক সময় ডিজিটালাইজেশন করা হয়েছিল। প্রাথমিক ক্ষেত্রে এটা বেশ সময়সাপেক্ষ হয়েছিল বলে তিনি জানান। 'আমি মনে করি আধুনিকায়ন করতে গেলে যথাযথভাবে এটা শুরু করে ৫-৭ বছরে দ্রুত শেষ করতে হবে। সেক্ষেত্রে এর খরচটা আসবে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বা অন্যান্য দাতারা যারা আগ্রহী তাদের কাছ থেকে। এছাড়া পুরনো সিএস, আরএস রেকর্ড স্ক্যান করে তার সফট কপি বিক্রয়ের মাধ্যমেও সরকার রাজস্ব পেতে পারে।' তাঁর মতে, এই ম্যানুস্ক্রিপট রাখার জন্য পরিশ্রম করতে হবে না। সর্বশেষে আরএস রেকর্ড যা এখন সর্বত্র ব্যবহৃত, তা স্ক্যান করে ওয়ার্ড ডকুম্যান্ট হিসেবে কনভার্ট করতে হবে, যাতে পরবর্তিতে কাজ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে সফটওয়ার ডেভেলাপ করে বা বাংলা ওসিএস এর মাধ্যমে অথবা অপারেটর দ্বারা ডিজিটালাইজ করা যেতে পারে বলে তিনি জানান। প্রাইভেট সেক্টরে টেন্ডার করলে অনেক প্রস্তাব পাওয়া সম্ভবপর হবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

তাঁর মতে, যে ম্যাপগুলো দ্বারা বর্তমানে রেকর্ড হচ্ছে, সেগুলো আগে প্রাথমিক ভাবে সংরক্ষন করে নেয়া খুবই দরকার। দুই মৌজার বা জেলার সীমানা নির্ধারণে কিছু সমস্যা হয়, কিন্তু এগোলো কখনই বড় ইস্যু নয় যার জন্য এই কাজটা সম্ভবপর হতে বাধার সম্মুখিন হবে।

সম্মানিত প্যানেলিস্টদের আলোচনা পর্ব

ডিজিটাল ম্যাপের মধ্যে ভুমির মালিকানা পরিবর্তনকে লিপিবদ্ধ করে রাখা সম্ভব হয়। পুরাতন ম্যাপকে হালনাগাদ করলে সহজেই বর্তমান ম্যাপগুলো পাওয়া যাবে।

এই পদ্ধতির খরচের ব্যাপারে তিনি বলেন, পুরাতন রেকর্ডকে ওয়ার্ডে প্রসেস করতে অপারেটরের খরচ কতো হবে সেটা নির্ধারন করে রাখতে হবে। প্রতি মৌজায় খরচের শতকরা ১০ শতাংশ জমির মালিকদেরই দিতে হবে। এভাবে খরচ শেয়ারিং এর মাধ্যমে রেকর্ড ও ম্যাপ ডিজিটাইজ করতে হবে। এছাড়া প্রতি প্রকল্পে পুনর্বাসনের প্রস্তাবনা রাখতে হবে বলে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

জনাব করিম গাজী

প্রাক্তন উপ-সচিব

করিম গাজী সবাইকে সালাম দিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন, 'ভূমি অধিগ্রহন একটি জনস্বার্থ ও জনসংশ্লিষ্ট বিষয় এটি সর্বপ্রথম আমাদের সুনির্দিষ্ট করতে হবে। জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে জেলা ভূমি কমিটিকে প্রাথমিকভাবে এর উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য নির্দিষ্ট করতে হবে। এটা যদি কম্প্যাক্ট টাউনশিপের জন্য হয়, তাহলে এর বাসিন্দা জনগনের সম্মতিকে প্রাধান্যে রেখেই অগ্রসর হতে হবে। একইসাথে সরকারের উচ্চ পর্যায়ে এ বিষয়ে নীতিনির্ধারণমূলক কাজে সম্মতি প্রদান প্রক্রিয়াটি ফলপ্রসু হবে।'

তিনি মনে করেন, এই উপলব্ধিটা স্থানীয় থেকে জাতীয় পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে। কী পদ্ধতিতে কাজ করলে আমাদের জমি কম ক্ষতিগ্রস্থ হবে ও জনসাধারন উপকৃত হবে, সেটা নির্ধারণ করতে হবে। তাঁর মতে, কাজ শুরু করার পরে অনেক সমস্যা দেখা দিতে পারে, জমির মালিকানা নিয়ে অনেকের মামলা থাকতে পারে। অনেক এলাকা থাকতে পারে যেখানে অধিগ্রহন কার্যক্রম বন্ধ আছে। এই প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে তিনি বলেন, জেলা প্রশাসক হতে মন্ত্রনালয়ের অনুমতিক্রমে জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটিতে ভূমি অধিগ্রহণের বিষয়টি পেশ করা হবে। ভূমি বরাদ্দ কমিটি সেখানকার জমির অবস্থা, দলিলের সত্যতা, বসতবাড়ি এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পূনর্বাসনের ব্যবস্থা এবং সর্বপরি পরিবেশের উপযোগিতা সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করে। এই সম্পূর্ণ আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়াটি একটি দীর্ঘ সময়ের কাজ বলে তিনি মন্তব্য করেন।

তিনি জানান, ১৯৫৯ সালের রাষ্ট্র অধিগ্রহন আইনে ১১৯, ১২৫ ধারায় যৌথ খামার প্রতিষ্ঠার বিষয়টি অনেকদুর অগ্রসর হলেও এর সফলতা দেখা যায়নি। এই পথে অগ্রসর হওয়া যায় কীনা সেটাও আমাদের চিন্তা করা যেতে পারে। ভূমি অধিগ্রহণ কাজে দীর্ঘসূত্রীতা, প্রাপ্তির পর থেকে প্রস্তাবকারী পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে লোকজনকে নোটিশ, হেয়ারিং, ক্ষতিপুরন প্রদান এগুলো সব শেষ করতে ৪৬৬ দিন লেগে যায়। এবং ডিসি অফিস, কমিশনার অফিস ও মন্ত্রনালয়ে পর্যায়ক্রমে দৌড়াতে হয় এই কাজের জন্য। এই

প্রফেসর সারোয়ার জাহান
নগর ও পরিকল্পনা বিভাগ
বুয়েট

ড. সরোয়ার জাহান জানান, একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশে শিল্পায়ন, অবকাঠামো ও বিনিয়োগ এই তিনটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এবং এর জন্য সঠিক ভূমি ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। অপরিকল্পিত নগরায়ন ভূমির মুল্য বাড়িয়েছে ঠিকই কিন্তু ভূমির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারেনি। বৈদেশিক রেমিট্যান্সের বিনিয়োগ জমিতে হওয়ার ফলে জমির মুল্য বেড়ে চলেছে। আমাদের দেশে 'কম্পালসারি ল্যান্ড একুয়েজেশান' চালু আছে। এর সুবিধা হলো এক্ষেত্রে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে সরকারের ক্ষমতা ব্যবহার করে দ্রুত গতিতে উন্নয়ন করা যায়। কিন্তু জমির প্রকৃত মালিকেরা এর সুদূরপ্রসারী ফল লাভে বঞ্চিত হন। অনেক ক্ষেত্রে ভূমির প্রাপ্য মুল্যের একটা বড় অংশ সঠিক ভাবে বিনিয়োগ করতে না পেরে অনেকে দরিদ্র হয়ে পরে।

তিনি জানান, ভূমি এডজাস্টমেন্টের লভ্যাংশ কিভাবে হিসাব করা যায় এ সম্পর্কিত উদাহরন বাইরের দেশগুলো থেকে দেখা যেতে পারে। ল্যাটিন আমেরিকার শহরগুলোতে একটা এলাকায় অবকাঠামো কতটুকু এলাকাজুড়ে এবং কিভাবে করা হয়েছে সেটা দেখা হয়। তারপর এর লভ্যাংশ হিসাব করে কোন প্লটের দাম কত সেটা বের করা হয় এবং লভ্যাংশ বণ্টন করা হয়। পরবর্তী কালে এলাকাগুলোর ডেভেলপমেন্ট এভাবেই প্রয়োগ করা হয়।

তিনি মনে করেন, আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় গুজরাটের মতো ল্যান্ড কন্সলিডেশান বা ল্যান্ড রিএডজাস্টমেন্ট পদ্ধতি বাংলাদেশের জন্য একটা পাইলট প্রজেক্ট এর মাধ্যমে এপ্লাই করা যেতে পারে। তাঁর মতে সমাজবিজ্ঞানী, পরিকল্পনাবিদ ও প্রকৌশলীদের নিয়ে একটি সাংগঠনিক ইউনিট করে পরীক্ষামূলক একটি পাইলট প্রকল্প করতে হবে। এই প্রজেক্ট এর মাধ্যমে যদি জমির দাম ১০ গুন বেড়ে যায়, তাহলে সেটার যে লাভ হবে সেটা সবাইকে বোঝাতে হবে।

জনাব শামসুল হুদা
নির্বাহী পরিচালক
এএলআরডি

শামসুল হুদা বলেন, বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের নির্বাচনী ইশতিহারে 'জাতীয় ভূমি সংস্কার কমিশন' গঠন করার কথা থাকলেও, গত সাড়ে চার বছরে তা বাস্তবায়ন হয়নি।

আমাদের দেশে ভূমি জবর দখল করে, তা পয়সা খরচ করে টিকিয়ে রেখে, সেখানে স্থাপনা তৈরী হয়। এটা আমাদের একধরনের কালচার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের সিস্টেম যদি কার্যকর না হয় তাহলে এর পরিবর্তনের কথা আমাদের অবশ্যই ভাবতে হবে। এর জন্য আমাদের জাতীয় একটা প্রাধান্য দরকার ও একসাথে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক সংস্কার দরকার।

তাঁর মতে, আমাদের দেশে ভূমি জবর দখল আসলে দুই ভাবে হয়। যেমন দরিদ্র মানুষেরা যারা নদী ভাঙ্গনের বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার তারা সরকারী জায়গা দখল করে বাস করে, তাদের সংখ্যা খুবই কম যা প্রায় ২০ শতাংশ। বাকি ৮০ শতাংশ ভূমি দস্যু বা ল্যান্ড গ্রাবাররা। কিন্তু যেটা দেখা যায় যে, এই আশি শতাংশের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়না এবং উচ্ছেদ করা হয় ২০ ভাগকেই।

সম্মানিত প্যানেলিস্টদের আলোচনা পর্ব

কাজটা করার জন্য স্থানীয়ে পর্যায়ে খুব ভালোভাবে রেকর্ড সংশোধনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সরকারী পর্যায়ে কোনো আইনের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে বিচার/ সালিশের মাধ্যমে মালিকানা সংক্রান্ত সমস্যা নিষ্পত্তি করা গেলে মানুষের আস্থা অর্জন দ্রুততর হবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

তাঁর মতে, ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার ক্ষতিপূরন একটি বড় সমস্যা। আশেপাশের জমির বাজারদরের নুন্যতম ৫০ শতাংশ বেশি দিতে হয়। এক্ষেত্রে, বাস্তবতা হলো সাব রেজিস্ট্রার অফিসে জমির প্রকৃত মুল্য পাওয়া সম্ভব হয়না।

অধ্যাপক সেলিম রশিদ
পিএইচডি
চেয়ারপারসন
কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশন

প্রফেসর সেলিম রশীদ ভূমি বিষয়ক সমস্যাকে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা বলে অভিহিত করেন এবং এর সমাধানকল্পে সিটি ফাউন্ডেশন একটি আলোচনার প্লাটফর্ম তৈরি করবে বলে তিনি ইচ্ছা ব্যক্ত করেন।

নতুন আইন প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের সাথে সাথে স্থানীয় জনগণকে যদি এর সুফল সম্পর্কে বোঝানো যায়, তাহলে সবার লাভ হবে বলে তিনি মনে করেন। তাঁর মতে, অবকাঠামোগত উন্নয়নের সাথে ভূমির মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং এটা অর্থনৈতিকভাবে স্বীকৃত। ভারতের গুজরাট এবং দক্ষিণ কোরিয়ার অভিজ্ঞতা জানিয়ে তিনি বলেন, সেখানে সরকার ভূমি অধিগ্রহনের বিনিময়ে জনগণকে এর উপযুক্ত মুল্য পরিশোধ করে এবং এটা স্বীকৃত পদ্ধতি। বাংলাদেশের জনগণকে কিভাবে ভূমি অধিগ্রহনের ব্যাপারে অনুপ্রানিত করা যায় সেদিকে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।

সম্মানিত প্যানেলিস্টদের আলোচনা পর্ব

ড. আকবর আলী খান
সাবেক উপদেষ্টা
তত্ত্বাবধায়ক সরকার, বাংলাদেশ

ড. আকবর আলী খানঃ কম্প্যাক্ট টাউনশিপ করার আগেই ল্যান্ড রেকর্ডকে ডিজিটাল করতে হবে বলে তিনি মনে করেন। তথাপি, এটা করা হলেই যে জমির সব সমস্যা দূর হয়ে যাবে তিনি তা মনে করেন না। এছাড়া এই প্রক্রিয়ায় বেসরকারী উদ্যোগে কাজ করতে হলে সরকারী খাতের অংশ হিসেবেই করতে হবে। দ্বিতীয়ত, ভূমি অফিস, সাব রেজিস্ট্রার অফিস ও সর্বপরি আদালত এই তিনটি প্রতিষ্ঠান তাদের তিন ধরণের নীতির কারনে আলাদাভাবে কাজ করে। তাঁর মতে, এই তিনটা অফিস একসাথে কাজ করলে আমাদের অনেক সুবিধা হবে।

'কম্প্যাক্ট টাউনশিপ করা আমাদের লক্ষ্য হলে, ভূমি অধিগ্রহন এর একটি অংশ হতে পারে। সেক্ষেত্রে ভূমি অধিগ্রহন বর্তমান আইনে করা হবে, না অন্য কোন উপায় প্রয়োজন হবে, তা বের করা দরকার। এছাড়া, এতে কোনো আদিবাসী তার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট হারাতে চায়না, তাকে কিভাবে ক্ষতিপূরন দেয়া হবে সেটা বিবেচনা করতে হবে।'

অধিগ্রহনের সময় একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা দেয়া যেতে পারে জমির মালিককে জমির দাম হিসেবে ও পরবর্তিতে লভ্যাংশ তাদের শেয়ার করা যেতে পারে। আমাদের দেশের ১৮৭২ সালের নগর উন্নয়ন বিধি অনুযায়ী, রাস্তা ও এর পাশের জমির দাম বাড়লে ক্ষতিপূর্ণ দেয়া হলেও এর পরবর্তী প্লটগুলোর মালিকরা কিভাবে লাভবান হচ্ছে তার বের করা হয়না। এছাড়া নতুন আইন প্রনয়নের আগে মানুষের সম্মতি আছে কিনা দেখতে হবে।

তাঁর মতে, "আসলে আমাদের একেবারে নিচ থেকে চিন্তা করতে হবে এবং আমাদের বিভিন্ন এলাকায় ২/৪টি প্রকল্প গ্রহন করলে লোকে নিজেরাই এর পক্ষে চলে আসবে। হঠাৎ আইন করলে অনেকে ভয় পাবে এবং এটা সম্ভবপর নাও হতে পারে।"

এর সমাধানকল্পে তিনি তিনটি প্রস্তাব দেন। প্রথমত, মানুষকে প্রাথমিক পর্যায়ে একেবারে নিচ থেকে বুঝাতে হবে। দ্বিতীয়ত, ল্যান্ড একুইজিশনের প্রশ্নে না গিয়ে বিকল্প আছে কিনা, আমাদের চিন্তা করা দরকার। তৃতীয়ত, সরকারের নিজেরই অনেক জায়গা আছে, যা প্রাইভেট সেক্টরের তুলনায় কার্যকর। এখানে এগুলোর ব্যবহার করা যায় কিনা তাও ভেবে দেখতে হবে বলে তিনি জানান।

সম্মানিত প্যানেলিস্টদের আলোচনা পর্ব

জনাব মাহবুব জামিল
চেয়ারম্যান
সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেড

জনাব মাহবুব জামিলঃ ভৌগলিক অবস্থান ও সীমিত ভূমির মাঝে অনেক মানুষের বসবাস উন্নয়নের পথে একটি সমস্যা বলে মনে করেন। কম্প্যাক্ট টাউনশিপের মাধ্যমে আমাদের সীমিত ভূমির মধ্যে যে বিক্ষিপ্ত বসতি রয়েছে, তা ভূমির যথাযথ ব্যবহার করে গুচ্ছ আকারে চলে আসলে উন্নয়নের পথ অনেকটা সুগম হবে বলে তাঁর ধারনা।

তিনি বলেন, 'আমার গভীর বিশ্বাস, যারা একেবারেই দরিদ্র, তাদের যদি সুবিধার এবং মঙ্গলের কথা বোঝানো যায়, তাহলে তারা সেটা গ্রহন করে। স্থানীয় সরকারকে আমরা সবসময়ই শক্তিশালী করনের কথা বলে আসছি। আইনগত ভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে স্থানীয়ক্ষেত্রে তারা সুবিধাগত শক্তি ভোগ করছেন।'

তিনি বলেন, 'আমরা যদি একটা প্রক্রিয়াগত ভাবে জনসাধারণকে আশ্বস্ত করতে পারি, তাহলে জনরোষ কখনই হবেনা। প্রত্যেকে একটা নির্দিষ্ট জায়গা ও বাড়ি পাবে, সেটার একটা নিশ্চয়তা দিয়ে যদি পুনর্বাসন করা সম্ভব হয়, তাহলে ব্যপারটা সুবিধাজনক হবে। এছাড়া ব্যাকওয়ার্ড ও ফরোয়ার্ড লিঙ্কেজের মাধ্যমে অনেকে কাজ ও চাকরি পেতে পারে। তাঁর মতে, স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করা সবক্ষেত্রে সুবিধাজনক নাও হতে পারে, কেননা এই শক্তি গরিব মানুষদের বিপক্ষে চলে যেতে পারে। নগর জীবনের আকর্ষণ, নাগরিক সুবিধা অভস্থতা মধ্যবিত্ত কিম্বা নিম্ন মধ্যবিত্তের উপর প্রভাব ফেলছে এবং কেউই গ্রামে ফিরে যেতে আগ্রহী নয়। শহরের জমির ঊর্ধ্বমুখী দাম সবাইকে প্ররোচিত করছে দুর্নীতির দিকে। এই শহর কেন্দ্রিক জীবন থেকে কমপ্যাক্ট টাউনশিপ একটি উত্তরনের পথ হতে পারে বলে তিনি অভিমত দেন।

আলোচনা পর্ব_২

আমন্ত্রিত অতিথিদের আলোচনা পর্ব

বক্তা ১: (মুন্সী আলাউদ্দিন আহমেদ) যে পাইলট প্রজেক্টের কথা বলা হচ্ছে, তার প্রাথমিক পুঁজি কোথেকে আসবে জানতে চেয়ে প্রশ্ন করেন।

বক্তা ২: কম্প্যাক্ট টাউনশিপে শুধু হাউজিং হবে না স্কুল কলেজ, কল কারখানা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও হবে কিনা জানতে চান।

বক্তা ৩: (আরেফিন সিদ্দিকী, লেখক) তাঁর মতে, ডেভেলাপমেন্টের পরে যে লভ্যাংশ বণ্টনে অসমতা দেখা দিতে পারে। যারা ধনী কৃষক, তারা এর ফল পেতে পারবে, ভূমিহীনরা এক্ষেত্রে বঞ্চিত হবে। ভূমি অধিগ্রহনের সময় পুরো এলাকাটা প্রথমে অধিগ্রহন করে, এর জমির মালিকদের মধ্যে আনুপাতিকভাবে রিলোকেট ও পুনর্বাসন করতে পারলে সেটা সবচেয়ে সুবিধাজনক হবে।

বক্তা ৪: (ডক্টর শাকিল আখতার, প্রফেসর ও ইউআরপি এর হেড, বুয়েট) বাংলাদেশে ভূমি পুনঃসমন্বয় প্রক্রিয়াতে একটি 'উইন-উইন' বাস্তবতা সম্ভব এবং এটি বুয়েটের ছাত্ররা তাদের প্রজেক্টে করেছে।

তাঁর মতে ভারতের 'ল্যান্ড একুজেসানের' নতুন আইন, যা 'ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া' নামে অভিহিত, সেখানে যত পরিমাণ ভূমি আবশ্যক সেটা হিসেব করে তা বণ্টন করা হয় যা অত্যন্ত কার্যকর একটি পদ্ধতি। এছাড়া জার্মানি,তুর্কিতে ভূমি সমন্বয় বিষয়ক আইন আছে। সেখানে বলে দেয়া হয় সরকার প্রয়োজনে অধিগ্রহন করতে পারে। এই আইনগুলো আমাদের জন্য ফলো করা যেতে পারে।

তিনি জনাব মাহবুব জামিলের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বলেন, ভূমির মূল্য নির্ধারন পৃথিবীর অনেক দেশের মতই রিয়েল এস্টেট এজেন্সিগুলোকে কাজে লাগিয়ে জেনে নেয়া সম্ভব হতে পারে।

আলোচনা পর্ব_২

আমন্ত্রিত অতিথিদের আলোচনা পর্ব

বক্তা ৫: (মোঃ জাকারিয়া) ল্যান্ড ডিজিটাইজেশানের মতো টেকনিকাল বিষয়টি ভেন্ডরদের কাছে দেয়াটা কতটুকু বাস্তব সম্মত ও সময় সাপেক্ষ ব্যপার হবে তা বিবেচনা করা প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন।

বক্তা ৬: (জনাব খলিলুজ্জামান) ল্যান্ড একুজিশনের জন্য ও ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট এর কাজ, সরকার সরাসরি তার অর্থায়নে করে থাকে, অথবা বাইরের ফান্ডিং প্রতিস্থান জড়িত থাকে এতে। সরকার ফান্ডিং করলে ডেপুটি কমিশনারের মাধ্যমে ল্যান্ড একুজিশন হয়। বাইরের ফান্ডিং হলে, জনগন যাতে ন্যায্য দাম পায় সেজন্য একটা ফান্ড করা হয়। প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট প্রস্তুত না থাকায় এই প্রক্রিয়া দীর্ঘতর হয়। মাঝের সময়ে একজিকিউটিং এজেন্সি যে কন্টাক্টর করে, তার কাজ দেরি হতে থাকে। ফলে, ডোনার এজেন্সি একটা সময়মত প্রকল্প শেষ করতে না পারায়, জনগন তার মূল্যায়ন থেকেও বঞ্চিত হয় এবং ক্ষতিপুরন পায়না। পরবর্তিতে আরেকটা ডোনার এজেন্সি কাজ করতে আসলে সেই প্রকল্পও একইভাবে বাধাগ্রস্থ হয়। এক্ষেত্রে ল্যান্ড ডিজিটাইজেসন হলে তার ডেভেলপমেন্ট রেট আরো বেশি হতে পারে বলে তিনি জানান।

বক্তা ৭: কৃষিজমি রক্ষা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে একটা কৃষিজমি রক্ষার আইনের একটা খসরা করা হলেও এই আইন বাস্তবায়ন ও প্রণয়ন হয়নি।

বক্তা ৮: ল্যান্ড কনসলিডেসান বা রিএডজাস্টমেন্ট এর ব্যপারে প্রাথমিক ভাবে সরকারকে আইন ও গাইডলাইন দিতে হবে। এছাড়া নেগোসিয়েশন করার জন্য লোকাল লেভেলে দক্ষ জনবল থাকা দরকার। সবশেষে , জনগণের সাপোর্ট থাকলে সহজসাধ্য হবে এই প্রক্রিয়াটি।

সেমিনার পেপার

ডিজিটালকরনঃ যেভাবে করা যেতে পারে

মোঃ আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী

প্রাচীন কৃষিনির্ভর অর্থনীতির শুরু থেকেই এদেশে ভূমি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। বহুকাল আগে থেকেই রাষ্ট্রের অর্থনীতি ভূমি থেকে উতপাদিত কৃষিপন্য এবং ভূমি রাজস্বের উপর অনেকাংশে নির্ভর। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সাথে সামঞ্জস্য রাখতে ভূমি সঙ্কট দেখা দেয়। নগরায়ন, অবকাঠামোর উন্নয়ন এবং গ্রামীণ এলাকায় বসতিগুলোর আয়তন বেড়ে যাবার কারনে প্রতি বছর আমাদের দেশে কৃষিভূমি, জলাভূমি এবং বনভূমির পরিমান আনুপাতিকহারে হ্রাস পাচ্ছে। এমনকি নগর এলাকায় পার্ক ও খেলার মাঠের মত উন্মুক্ত জায়গাগুলোও বাদ যাচ্ছেনা।

বাংলাদেশে ভূমি ব্যবস্থাপনার অকার্যকারিতার অন্যতম কারন হল- জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ভূমির চাহিদা এবং সরকারের নিয়মিত ভূমি জরিপ ও ভূমি উপাত্ত হালনাগাদ করার ব্যর্থতা। ব্রিটিশ আমলের মুদ্রিত ‘ক্যাডেস্ট্রাল সার্ভে রেকর্ড’ এবং ‘রিভিশনাল সেটেলম্যানট অপারেশন’ এর রেকর্ডগুলো জেলা কমিশনারের অফিসগুলোতে অব্যস্থাপনার সাথে সংরক্ষিত করা হয়েছে, যার ফলে এর অধিকাংশই এখন জীর্ণ। ভূমি রেকর্ডের সাথে জড়িত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অনেকেই রেকর্ড জালিয়াতি ও অবৈধ লেনদেনের সাথে জড়িত। এই ‘লাভজনক ব্যবসার’ কারনে ভূমি অফিসগুলোতে এবং সমগ্র ব্যবস্থাপনায় দুর্নীতি গ্রাস করেছে। এছাড়া আইনী প্রক্রিয়া অনেক সময়সাপেক্ষ হওয়ার কারনে ভূমি দস্যুরা নিম্নবিত্তদের জমি বেদখল করার সুযোগ পাচ্ছে।

ভূমি রেকর্ডকে যদি আমরা ডিজিটাল করে আধুনিকায়ন করতে পারি, তাহলে এই অবস্থার উন্নতি হবে। ২০০৬-২০০৮ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ‘রেগুলেটরি রিফরমস কমিশন’-এ ভূমি রেকর্ড আধুনিকায়নের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। আমি সেই কমিটির আহ্বায়ক - সদস্য ছিলাম। আমরা ভূমি সংক্রান্ত সমস্যাগুলোকে খতিয়ে দেখেছিলাম এবং ভারতের পুনে ও কলকাতায় ডিজিটালকরণ কিভাবে করা হচ্ছে সেটা দেখতে গিয়েছিলাম। কমিটি একটি রিপোর্ট তৈরি করে, যা ২০০৮ সালে ‘রেগুলেটরি রিফরমস কমিশন’ এর মাধ্যমে সরকারের কাছে পেশ করা হয়। এর পর বলতে গেলে আর কোনও অগ্রগতিই হয়নি।

সেমিনার পেপার

ডেমরা ও মানিকগঞ্জে পরীক্ষামুলকভাবে ডেপুটি কমিশনারের উদ্যোগে ভূমি ডিজিটালকরনের কাজ শুরু করা হয়েছিল, কিন্তু সেটাও পরবর্তীতে সরকার পর্যন্ত পৌঁছায়নি। যদিও বা এই উদ্যোগ গৃহীতও হত, আমার ধারনা এটা বাস্তবায়ন করতে অবকাঠামোগত সুবিধা না থাকায় সরকারের কমপক্ষে ৩০ থেকে ৫০ বছর লেগে যেত। ইউরোপীয় ইউনিয়ন সহ কিছু দাতা সংস্থা যদিও আগ্রহ প্রকাশ করেছে, তবুও সেটা বাস্তবতার প্রেক্ষিতে অন্তত দশ বছর লেগে যাবে শেষ করতে।

আমার মতে, ভূমি রেকর্ডের এবং ভূমি প্রসাশনের ডিজিটালকরনের একটি কার্যকর গ্রহণযোগ্য উপায় হতে পারে, এক্ষেত্রে এক বছর মেয়াদী একটি পাইলট প্রজেক্টের সময়সীমা নির্ধারণ করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রাইভেট অপারেটরদের এইক্ষেত্রে নিয়োগ দেয়া। প্রাইভেট অপারেটররা এইক্ষেত্রে সব পুরাতন রেকর্ডকে স্ক্যান করে ডিভিডিতে রুপান্তর করবে এবং সেটা এসি ও ডিসি ভূমি অফিস, জেলা জজের অফিস, জেলা কমিশন ও ভূমি মন্ত্রনালয়ে সংরক্ষিত থাকবে। এই পদক্ষেপ নেয়ার ফলে রেকর্ড জালিয়াতি বা নষ্ট করার অবৈধ কাজগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। ভূমি মন্ত্রনায়লের আরকাইভে কেন্দ্রীয় ভাবে এক সেট রেকর্ড সংরক্ষন করা যেতে পারে।

একইভাবে সকল সিএস ও আরএস রেকর্ড স্ক্যান করে ডিসি, ডাইরেক্টর জেনারেলের অফিসে এবং ভূমি প্রশাসন বোর্ডে ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের অফিসে সংরক্ষন করা যেতে পারে। ম্যাপের স্ক্যান কপি ডিজিটালকরে এবং ভেকটর করার মাধ্যমে ভূমির পরিবর্তন, যেমন- ভূমি বণ্টন, মালিকানা পরিবর্তন এবং ভূমির ধরন পরিবর্তনও লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হবে। উপজেলা লেভেলে নিয়মিত হালনাগাদের ফলে এই পরিবর্তনগুলো রেকর্ড হয়ে যাবে এবং ৫ বছর অন্তর অন্তর সম্পুরক নতুন ম্যাপ অনেকটা বিনা পরিশ্রমে পাবলিশ করা সম্ভবপর হবে।

স্ক্যানকৃত আরএস রেকর্ড এর পর ভেণ্ডরদের দ্বারা ওয়ার্ড ডকুমেন্ট হিসেবে কনভারট করা যেতে পারে। এগুলো প্রিন্ট করে ভূমি পরিচালনা কর্মকর্তাদের স্বাক্ষর নিয়ে ডিভিডি করে সংরক্ষন করে রাখা যেতে পারে।

পরের কাজটা হবে আরএস রেকর্ডে জমির মালিকদের লিস্ট অনুযায়ী প্লট বেসিসে রেকর্ডটি পরিবর্তন করা। এটা খসরা রেকর্ড হিসেবে প্রকাশ করা হবে। সব মালিকদের ভেনডরের অফিসে এসে বাধ্যতামুলকভাবে তাদের ডিজিটাল ছবি তুলতে হবে, যা পরবর্তীতে 'রেকর্ড অফ রাইট (আর ও আর) হিসেবে রক্ষিত হবে। এই প্রক্রিয়াটি শেষ হলেই সমগ্র ব্যাবস্থাপনাটি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে উন্মুক্ত করে দেয়া সম্ভব হবে।

স্ক্যান ও কনভার্সনের খরচটি সরকারের মাধ্যমে হতে হবে। কিন্তু সর্বশেষ আরএস রেকর্ডের স্ক্যান থেকে পরবর্তী কাজের খরচ ভূমি মালিকদের বহন করতে হবে। অথবা সামগ্রিক খরচের ১০ শতাংশ ভূমির মালিকেরা বহন করবে- এভাবেও এটি হতে পারে।

বাকি ৯০ ভাগ মৌজায় সমগ্র ভূমি দ্বারা ভাগ করা হবে এবং প্রতি শতাংশ জমির ক্ষেত্রে খরচ নির্ধারণ করা হবে। পরে ভূমির মালিক তার জমির আয়তন অনুযায়ী মুল্য পরিশোধ করবে এবং তার ছবি সহ আরওআর এর ডিজিটাল কপি সংগ্রহ করবে।

ভূমি মুল্য নির্ধারণেরও একটি সিস্টেম চালু করা প্রয়োজন যেখানে একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর এটা হালনাগাদ করা হবে। উত্তরাধিকারসুত্রে ভূমির মালিকানা পরিবর্তনের মত ব্যপারগুলোও এতে সংরক্ষিত হতে থাকবে।

বাংলাদেশে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য ক্রমবর্ধমান ভূমি মুল্যের রাজস্ব আদায়ঃ একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

প্রফেসার সেলিম রশিদ

চলুন চিন্তা করি, একটি রাস্তা নির্মাণের জন্য আমাদের ভূমির প্রয়োজন। আরো ধরা যাক, এই নতুন রাস্তাটি নির্মাণের ব্যাপারে কারো কোনও দ্বিমত নেই। যদি এক্ষেত্রে আমার জমি অধিগ্রহণ করে রাস্তাটি তৈরি হয়, তাহলে আমি একটি নামমাত্র ক্ষতিপুরন পাব। তাই, যেটা হবে, আমি স্বভাবতই ভূমি অধিগ্রহণের বিরোধিতা করব। আশেপাশের জমির মুল্য অনেক বেড়ে যাবে। আমার প্রতিবেশিরা সবাই লাভবান হবে এতে। তাই পারতপক্ষে অন্যদের লাভ হিসেব করলে আমি নিশ্চয়ই আমার জমি অধিগ্রহণ করা হোক এটা চাইবনা।

সমতা হবে যখন আমার প্রতিবেশী তার জমির বেড়ে যাওয়া মূল্যটা আমার সাথে শেয়ার করবে। তাই আমার প্রতিবেশীদের কাছ থেকে বর্ধিত ভূমি মুল্যের রাজস্ব আদায় করে সেটা যদি আমাকে ক্ষতিপুরন দেয়া যায়, তাহলে সেটা একটা বাস্তব সমাধান হতে পারে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যপার হচ্ছে এই ব্যপারটির সাথে একমত পোষণ করা।

এরপর ক্রমে ভূমি রেকর্ড এবং ভূমি মুল্য নির্ধারণের মত আলোচনাগুলো আমরা করতে পারব।

আমাদের কাজ হল এই পার্টিসিপেটরি ধারায় যেতে বাংলাদেশ সরকারের কোন আইন প্রযোজ্য হবে, সেটা খুঁজে বের করা।

ভূমি অধিগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় দলিলাদি

by Karim Gazi

যুগ যুগ ধরে জনস্বার্থে বা জনউদ্দেশ্যে স্থাবর সম্পত্তি (ভূমি) অধিগ্রহণ চলমান আছে। অধিগ্রহণ প্রত্যাশী সরকার বা বেসরকারী সংস্থা/ব্যক্তি যেই হোক না কেন এ জন্য বর্তমানে সরকারের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ম্যানুয়েল, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত নির্দেশাবলী অনুসরন করতে হয়।

(ক) বেসরকারী সংস্থা/ব্যক্তি কর্তৃক দাখিলকৃত অধিগ্রহণ প্রস্তাবের সহিত নিম্নলিখিত কাগজপত্র/তথ্যাদি (প্রত্যেকটির ৫ কপি করিয়া) সংযুক্ত করে দিতে হবে ঃ

১) প্রস্তাবিত প্রকল্প/উদ্দেশ্যের সারপত্রসহ উহা বাস্তাবায়নের জন্য অর্থায়নের উৎস এবং অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানের নিশ্চয়তা পত্র

২) নূন্যতম জমির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রত্যয়নপত্র

৩) প্রস্তাবিত জমির দাগসূচি (সর্বশেষ জরিপে মৌজার নাম, জে.এল নম্বর, দাগ নম্বর, দাগের শ্রেণী, দাগে মোট জমির পরিমাণ, অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ উল্লেখ থাকিবে।)

৪) লে-আউট প্লান।

৫) সর্বশেষ জরিপের নকশা (প্রস্তাবিত জমি লালকলি দ্বারা চিহ্নিত করিতে হইবে।)

৬) বিধিমালার ৭ নং বিধিমতে "জি" ফরমে প্রত্যাশী সংস্থার সম্মতিপত্র (৫০ টাকার ননজুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পের উপর)

৭) সংশ্লিষ্ট পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদ এর অনাপত্তিপত্র, (যেক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য)

৮) প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা।

(খ) জেলা প্রসাশকের নিকট প্রস্তাব দাখিলকরণ (ভূমি বরাদ্দ কমিটির বিবেচনা জন্য)।

(গ) জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির প্রস্তাব ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

(ঘ) মন্ত্রণালয়ে যাচাই-বাছাই।

(ঙ) মন্ত্রণালয় সন্তুষ্ট হয়ে অধিগ্রহণের অনুমতি দিলে জেলা প্রশাসকের দপ্তরে ভূমি অগ্রিহণ কেইস চালুকরণ।

(চ) অধিগ্রহণ কেইস যথাযথভাবে সৃজনের পর বিধিমোতাবেক ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ এবং বিতরন।

(ছ) দখল হস্তান্তর, গেজেট বিজ্ঞপ্তি ও নামজারী।

(জ) ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় প্রত্যাশী সংস্থার প্রস্তাব বিবেচনাকালে যে সব বিষয়ে পুংখানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করা হয় ঃ

১) প্রস্তাবের সহিত প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র/তথ্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে কিনা;

২) যে পরিমাণ জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব করা হইয়াছে, লে-আউট প্ল্যান ও প্রকল্পের বর্ণনা মতে উক্ত পরিমাণ জমি সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন কি না;

৩) অধিগ্রহণের ফলে অধিক সংখ্যক ঘরবাড়ি, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হইলে প্রত্যাশী সংস্থা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবে কি না;

ইভেন্ট চিত্র

অনষ্ঠিত সেমিনার

বক্তাদের সাথে আলোচনা

জনাব সেলিম রশিদ তাঁর বক্তব্য তুলে ধরছেন

Compact Township Foundation

The general objective of the CT Foundation is to provide an Institutional Platform to address the problem of land use in Bangladesh, with the focus upon a particular solution, called Compact Townships, involving the provision of urban facilities in rural areas in small, flood protected and eco-friendly townships. While Land is posited as the fundamental constraint in the development process, it is recognized that there are many resource constraints facing Bangladesh, particularly Water.

Vision

CT Foundation envisions the planned and governed society through its activities (e.g. policy research, advocacy, awareness & promotions) for a better society addressing all sorts of challenges and possibilities

© All Rights Reserved.
Compact Township Foundation, September, 2013.
www.ctfoundation.org

House No. 79(3rd floor/Left) # Road No. 12/A
Dhanmondi, Dhaka- 1209, Bangladesh